

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ (الْعَقَائِدُ)

আকাইদ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো আকিদাহ। আকিদাহ অর্থ বিশ্বাস। আর আকাইদ শব্দের অর্থ বিশ্বাসমালা। ইসলামের সর্বপ্রথম বিষয় হলো আকাইদ। ইসলামের মূল বিষয়গুলোর উপর মনে প্রাণে বিশ্বাস করাকেই আকাইদ বলা হয়। আকাইদের সবগুলো বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে। অর্থাৎ তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, আসমানি কিতাব, ফেরেশতা, তাকদির ইত্যাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন করার নাম আকাইদ। যে এসব বিষয়ে বিশ্বাস করে, সে-ই ইসলামে প্রবেশকারী বা মুসলিম।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- তাওহিদের স্বরূপ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কুফরের পরিচয়, কুফল ও পরিণতি বর্ণনা করতে পারব।
- শিরকের পরিচয়, কুফল ও পরিণতি বর্ণনা করতে পারব।
- বাস্তব জীবনে কুফর ও শিরক পরিহার করার উপায়সমূহ বলতে পারব।
- ইমান মুফাস্সাল (ইমানের বিস্তারিত পরিচয়) অর্থসহ শুদ্ধভাবে পড়তে, বলতে এবং এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আল্লাহর কয়েকটি গুণবাচক নাম ও এসবের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আল্লাহর গুণবাচক নাম সম্পর্কিত গুণসমূহ নিজ আচরণে প্রতিফলনের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- রিসালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।
- ওহির পরিচয় ও এর উপর বিশ্বাস স্থাপনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব এবং সিরাত ও মিযানের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব।
- আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে নৈতিক জীবনযাপনের উপায় বলতে পারব।
- নৈতিক জীবনযাপনে তাওহিদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ ১

(التَّوْحِيدُ) তাওহিদ

তাওহিদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। মহান আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করার নামই হলো তাওহিদ। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এক। তার কোনো শরিক নেই। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনিই আমাদের রক্ষক, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রিজিকদাতা। তিনি অনাদি ও অনন্ত। তার সমকক্ষ বা সমতুল্য কিছুই নেই। তিনিই একমাত্র মাবুদ। সকল প্রশংসা ও ইবাদত একমাত্র তারই প্রাপ্য। মনে প্রাণে এরূপ বিশ্বাস করাকেই তাওহিদ বলা হয়।

তাওহিদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আকাইদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো তাওহিদ। তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ ইমান ও ইসলামে প্রবেশ করে। তাওহিদে বা একত্ববাদে বিশ্বাসের পর আকাইদের অন্যান্য বিষয় বিশ্বাস করতে হয়। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য দুনিয়াতে অনেক নবি-রাসুল আগমন করেছেন। তাঁরা সকলেই তাওহিদের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। তাঁদের সকলের দাওয়াতের মূল বাণী ছিল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই'। এমন কোনো নবি ছিলেন না যিনি তাওহিদের কথা বলেন নি। বরং সকল নবি-রাসুলই তাওহিদের শিক্ষা প্রচার করেছেন। ইসলামের সকল বিধি-বিধান তাওহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাওহিদের পরিপন্থী কোনো বিধান ইসলামে নেই। সালাত, যাকাত, সাওম, হজ - সকল ইবাদতই এক আল্লাহর জন্য করতে হয়। কোনো কিছু চাইতে হলেও এক আল্লাহর নিকট চাইতে হয়। এটাই ইসলামের শিক্ষা। অতএব, ইসলামে তাওহিদের গুরুত্ব অপরিসীম।

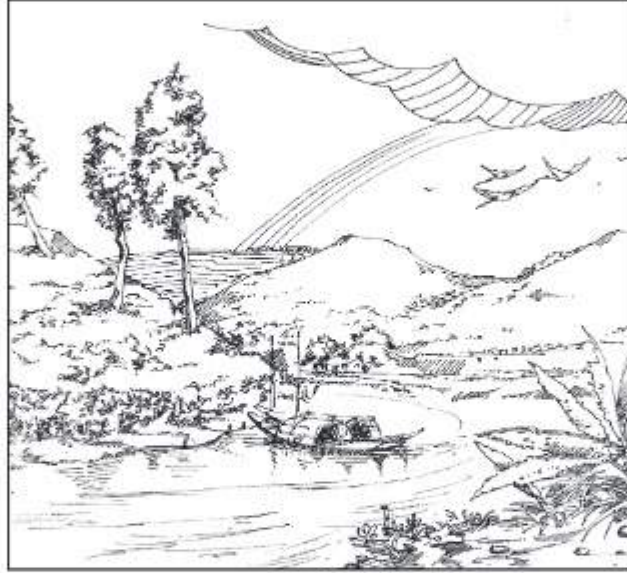
তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়াতে ও আখিরাতে সফলতা এনে দেয়। কেননা তাওহিদ মানুষকে আল্লাহর পরিচয় দান করে। মানুষ আল্লাহ তায়ালায় ক্ষমতা ও গুণাবলি জানতে পারে। দুনিয়ার কাজকর্মের জন্য মানুষকে পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে - এ শিক্ষা তাওহিদের মাধ্যমেই লাভ করা যায়। এ শিক্ষার দ্বারা মানুষ অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকলে এর ফলে সে আখিরাতে সফলতা লাভ করবে। দুনিয়ার জীবনেও তাওহিদে বিশ্বাসের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। তাওহিদে বিশ্বাসীগণ শুধু আল্লাহ তায়ালায় সামনে মাথা নত করে। অন্য কারো সামনে সে মাথা নত করে না। পক্ষান্তরে, তাওহিদে বিশ্বাস না করলে মানুষ বিপথগামী হয়ে যায়। সে গাছপালা, পশু-পাখি, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির নিকট মাথা নত করে। নানা মূর্তির পূজা করতে থাকে। ফলে মানুষের আত্মমর্যাদা বিনষ্ট হয়। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষের মধ্যে আত্মসম্মান ও আত্মসচেতনতা জাগিয়ে তোলে।

তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস মানুষকে এক জাতিত্ব বোধ এনে দেয়। ফলে মানুষ পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতায় উদ্ভূত হয়। পক্ষান্তরে, শিরক বা বহু উপাস্যের বিশ্বাস মানুষকে বহুদল ও গোষ্ঠিতে বিভক্ত করে দেয়। এক মানবজাতির বিভাজন পরিণতিতে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও হানাহানির কারণ হয়। এতে শান্তি ও মানবতা বিপর্যস্ত হয়। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে এক আল্লাহ তায়ালায় প্রতি নির্ভরশীল করে। ফলে বিপদে-

আপদে, দুঃখ-কষ্টে মানুষ হতাশ বা নিরাশ হয় না বরং আল্লাহর উপর ভরসা রেখে পূর্ণোদ্যমে কাজ করতে থাকে এবং সাফল্য লাভ করে। এভাবে তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়ার জীবনে সুখ-শান্তি ও সফলতার দুয়ার খুলে দেয়।

কতো বিশাল এ বিশ্বজগৎ। আমাদের পৃথিবী এর সামান্য অংশমাত্র। বড় বড় গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিকা, গ্যালাক্সি এ বিশ্বজগতে বিরাজমান। এগুলোর প্রত্যেকটিই সুশৃঙ্খলভাবে ঘুরছে। কোনোটি এর নির্ধারিত নিয়মের বাইরে যাচ্ছে না।

কে দিলেন এই নিয়ম? আমাদের পৃথিবী কতো সুন্দর। এতে রয়েছে বিশাল আকাশ, বিস্তৃত মাঠ, বড় বড় পাহাড়-পর্বত, প্রবাহমান নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর। এ সবকিছুই আপনা আপনি সৃষ্টি হয় নি। কে এসবের সৃষ্টিকর্তা?



প্রাকৃতিক দৃশ্য

ফল খেতে আমরা সবাই ভালোবাসি। আমগাছে আম হয়, জামগাছে জাম। আমরা কি কখনো কাঁঠাল গাছে আম কিংবা তরমুজ ধরতে দেখেছি? কেউই দেখিনি। কারণ কাঁঠালগাছে কাঁঠাল ছাড়া অন্যকোনো ফল হয় না। আমাদের চারপাশে রয়েছে নানারকম পশু-পাখি। কাক আমাদের অতিপরিচিত পাখি। কাক সবসময় কা কা করেই ডাকে। কাক কোনো দিন কোকিলের মতো ডাকে না। আবার গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল সবাই নিজ নিজ স্বরেই ডাকাডাকি করে। আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি কেন এমন হয়? কেন এক পশু আরেক পশুর স্বরে ডাকে না? গাছের ফল-ফসল, পশু-পাখির আচার-ব্যবহার- এসব কে নিয়ন্ত্রণ করেন?

বস্তুত আল্লাহ তায়ালাই এই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা। মহাজগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা তারই দান। পৃথিবীর সকল কিছুর স্রষ্টাও তিনিই। আর পশু-পাখি, গাছপালাসহ সবকিছুর নিয়ন্ত্রকও তিনি। তিনিই সবকিছু করেন। বরং তিনি যা ইচ্ছা করেন তা-ই হয়। এসব কিছুতে যদি একের বেশি নিয়ন্তা থাকত, তবে নানারকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ج

অর্থ : ‘যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত।’ (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ২২)

একটু চিন্তা করলেই আমরা বিষয়টি বুঝতে পারব। যেমন মহাজগতের সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা যদি একাধিক হতেন, তাহলে মহাজগৎ এত সুশৃঙ্খলভাবে চলত না। একজন সৃষ্টি চাইতেন সূর্য পূর্ব দিকে উঠুক। আরেকজন চাইতেন পশ্চিম দিকে। আবার অন্যজন দক্ষিণ বা উত্তর দিকে সূর্যকে উদিত করতে চাইতেন। ফলে এক চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।

এমনিভাবে আমরা যে আম না হয়ে কোনো কোনো সময় কাঁঠাল, জাম ইত্যাদিও হতে পারত। এতে আমরা বেশ অসুবিধায় পড়তাম। বস্তুত একাধিক সৃষ্টি বা নিয়ন্ত্রক থাকলে বিশ্বজগতের সুন্দর সুশৃঙ্খল অবস্থা বিনষ্ট হয়ে যেত। আল-কুরআনের অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَٰهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ مِمَّا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ط

অর্থ : “আর তার (আল্লাহর) সাথে কোনো ইলাহ নেই। যদি তা থাকত, তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টিকে নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত।” (সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত ৯১)

এ আয়াতেও তাওহিদ বা একত্ববাদের তাৎপর্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। নিচের উদাহরণের মাধ্যমে আমরা তা বুঝতে পারি। একাধিক সৃষ্টি থাকলে তারা তাঁদের সৃষ্টিকে নিয়ে আলাদা হয়ে যেতেন। যেমন আগুনের সৃষ্টি আগুন নিয়ে পৃথক হয়ে পড়তেন। অতঃপর সমস্ত কিছুকে আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দিয়ে তার নিজ ক্ষমতার প্রকাশ করতেন। তেমনি মহাসাগরের সৃষ্টি সারা পৃথিবী তার সৃষ্টি দ্বারা ভুবিয়ে দিতে চাইতেন। এভাবে সৃষ্টিগণ নিজ নিজ সৃষ্টি দ্বারা অন্যের উপর বিজয়ী হতে চাইতেন। ফলে আমাদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যেত। পৃথিবীর সকল কিছুই ধ্বংস হয়ে যেত।

এসব বর্ণনা এ কথাই প্রমাণ করে যে ইলাহ মাত্র একজনই। আর তিনি হলেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি সকল কিছুর সৃষ্টি, নিয়ন্ত্রক ও পালনকর্তা। তার হুকুম ও নিয়মেই সবকিছু পরিচালিত হয়। কোনো সৃষ্টিই এ নিয়মের ব্যতিক্রম করতে পারে না। এসব কাজে তিনি একক ও অদ্বিতীয়। আন্তরিকভাবে এরূপ বিশ্বাসের নামই তাওহিদ বা একত্ববাদ।

আমরা তাওহিদের পরিচয় জানব। এতে বিশ্বাস স্থাপন করব। এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে প্রকৃত ইমানদার হবো।

একক কাজ : তাওহিদের তাৎপর্য লিখবে এবং প্রত্যেকে তার পাশের বন্ধুকে দেখাবে।

বাড়ির কাজ : তাওহিদে বিশ্বাসের ফলে ব্যক্তির জীবন ও কর্মে কী কী পরিবর্তন আসতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ২ তাওহিদ ও নৈতিকতা

তাওহিদ অর্থ একত্ববাদ। আল্লাহ তায়ালা তার সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও অদ্বিতীয়-এ বিশ্বাসকে তাওহিদ বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝

অর্থ : “(হে নবি!) বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়।” (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত ০১)

আর নৈতিকতা হলো উত্তম নীতির অনুসরণ। অর্থাৎ কথাবার্তা, আচার-আচরণে উত্তম আদর্শ ও নীতির অনুসরণ করাকেই নৈতিকতা বলা হয়। তাওহিদ ও নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। তাওহিদের শিক্ষা মানুষকে ইসলামী নৈতিকতার দিকে পরিচালনা করে। যে ব্যক্তি তাওহিদে বিশ্বাসী, সে ইসলামী নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের স্রষ্টা। তিনি আমাদের উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের লালনপালন করেন। পৃথিবীর সমস্ত নিয়ামত তারই দান। তিনি আমাদের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। তিনিই একমাত্র উপাস্য। তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আমাদের সৃষ্টি করার মূল কারণ হলো তার ইবাদত করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন -

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

অর্থ : “আমি জিন এবং মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।” (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

সুতরাং মানুষের উচিত তার ইবাদত করা, শুকরিয়া আদায় করা। জীবনযাপনের সকল ক্ষেত্রে তার হুকুম ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। অতএব, তাওহিদে বিশ্বাস আমাদের আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির জন্য ভালো ও নৈতিক গুণাবলি অর্জনে উৎসাহিত করে। এভাবে নৈতিকতা অর্জনে তাওহিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

তাওহিদের মূল শিক্ষা হলো আল্লাহ তায়ালাকে একক সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করা। পাশাপাশি আল্লাহ তার গুণাবলিতেও একক-এ বিশ্বাসও তাওহিদের অন্তর্গত। তাওহিদ আমাদের আল্লাহ তায়ালা নানা গুণের পরিচয় দান করে। যেমন- আল্লাহ তায়ালা রাহমান, রাহিম, করিম, গাফফার, রায়যাক, খালিক, মালিক, রব ইত্যাদি। এ সমস্ত গুণের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তায়ালা একক। কেউই তার সমকক্ষ নয়। তিনি সকল গুণে অতুলনীয়। কোনো মানুষ বা সৃষ্টির পক্ষে তার এসব গুণের পূর্ণ অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। তবে মানুষ নিজ জীবনে এসব গুণের চর্চা করবে। উত্তম চরিত্রবান হবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা।

আল্লাহ তায়ালা এসব গুণ নৈতিকতার সর্বোত্তম স্তর। মানুষ যখন এসব গুণাবলি অনুশীলন করে, তখন তার সকল কাজ নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী হয়। তার দ্বারা নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে তাওহিদ মানুষকে আল্লাহ তায়ালা গুণাবলি অর্জন করতে উৎসাহিত করে।

অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালায় অন্যতম গুণ হলো শান্তিদাতা, সর্বশোভা, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। তিনি সবকিছু জানেন, সকল কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি একমাত্র মালিক ও মহাবিচারক। এসব গুণ মানুষকে নীতি ও আদর্শ মেনে চলতে সাহায্য করে। এগুলোতে বিশ্বাস করলে মানুষ কোনো অন্যায় ও দুর্নীতি করতে পারে না। কারণ সে জানে, আল্লাহ তায়ালা তার সকল কাজ দেখছেন। তিনি এগুলোর হিসাব নেবেন। অতঃপর মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেবেন। এভাবেও তাওহিদের শিক্ষা মানুষকে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

তাওহিদ মানুষকে আত্মমর্যাদাশীল করে তোলে। তাওহিদে বিশ্বাসীগণ শুধু আল্লাহ তায়ালায় ইবাদত করেন। আল্লাহ তায়ালাকেই ইলাহ বা প্রভু হিসেবে স্বীকার করে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

অর্থ : “তিনিই আল্লাহ। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৫)

সুতরাং তাওহিদে বিশ্বাসী মানুষ আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সৃষ্টির নিকট মাথা নত করে না। কারো আনুগত্য করে না। বরং মানুষ হিসেবে নিজ মর্যাদা রক্ষায় সচেতন থাকে। অপরদিকে অবিশ্বাসীরা সকল কিছুর নিকট ভরসা করে, মাথা নত করে। এটা মানবিক আদর্শের বিপরীত। ফলে দেখা যায় যে মানুষ তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমে মানবিক গুণ ও মর্যাদা লাভ করে। তাওহিদ মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দিয়ে থাকে।

আমরা জানতে পারলাম যে, তাওহিদ ও নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাওহিদ নানাভাবে মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। যুগে যুগে তাওহিদে বিশ্বাসী মানুষগণ ছিলেন নৈতিকতার উত্তম আদর্শস্বরূপ।

আমরাও তাওহিদে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করব। অন্যায়, অত্যাচার ও দুর্নীতি করব না। জীবনের সকল ক্ষেত্রে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির অনুশীলন করব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর খুশি হবেন। আমাদের জীবন সুন্দর ও শান্তিময় হবে।

দলগত কাজ : ‘শুধু তাওহিদে অটল বিশ্বাস মানুষকে বলিষ্ঠ ও নৈতিক চরিত্র উপহার দিতে পারে।’ শ্রেণিতে বিষয়টি দলগতভাবে আলোচনা করে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপনা করবে।

পাঠ ৩

কুফর (الْكُفْرُ)

কুফর আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, গোপন করা, ঢেকে রাখা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালা ও ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকে কুফর বলে। যে ব্যক্তি কুফরে লিপ্ত হয়, তাকে বলা হয় কাফির (كَافِرٌ)।

কুফর হলো ইমানের বিপরীত। কুফরের নানা দিক রয়েছে। যেমন:

- ক. আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করা।
- খ. ইমানের অন্যান্য মৌলিক বিষয়কেও অস্বীকার করা। যথা: নবি-রাসুল, আসমানি কিতাব, ফেরেশতা, পরকাল, তাকদির, পুনরুত্থান, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদিকে অবিশ্বাস করাও কুফর।
- গ. ইসলামের ফরজ ইবাদতগুলোকে অস্বীকার করাও কুফর। যেমন- সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদি ইবাদতগুলো অস্বীকার করা।
- ঘ. হালাল জিনিসকে হারাম বলে বিশ্বাস করাও কুফর। তেমনি হারাম বস্তুকে হালাল বলে বিশ্বাস করাও কুফরের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- কেউ যদি মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ ইত্যাদিকে হালাল মনে করে, তবে সেও কুফরি করে।

কুফরের কুফল ও পরিণতি

কুফরের কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি নৈতিকতা ও মানবিক আদর্শের বিপরীত। কেননা, আল্লাহ তায়ালা আমাদের স্রষ্টা। তিনিই আমাদের রিজিকদাতা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। সুতরাং তাঁকে অবিশ্বাস করা কিংবা তাঁর বিধান অস্বীকার করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। এটি চরম অকৃতজ্ঞতার শামিল। এর মাধ্যমে দয়াময় আল্লাহ তায়ালায় বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য ও বিদ্রোহ প্রকাশ করা হয়। তাই কাফিরদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। আখিরাতে কাফিরদের স্থান হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

অর্থ: “আর যারা কুফরি করে এবং আমার নিদর্শনগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।” (সূরা আল-বাকার, আয়াত ৩৯)

কুফরির শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। অবশ্য কাফির ব্যক্তি যদি পুনরায় ইমান আনে এবং ইসলামের সমস্ত মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে সে এ শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে। সাথে সাথে তাকে অবশ্যই পূর্ববর্তী কুফরি কাজের জন্য আন্তরিকভাবে লজ্জিত হতে হবে এবং খাঁটি মনে তওবা করতে হবে।

অতএব, আমরা কুফর ও এর কুফল সম্পর্কে জেনে এ থেকে বেঁচে থাকব। এজন্য সর্বদা সতর্ক থাকব। আল্লাহ তায়ালায় নিকট কুফর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করব।

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীরা দুই দলে ভাগ হবে। একদল কুফরের পরিচয় বর্ণনা করবে। অপর দল কুফরের কুফল ও পরিণতি বর্ণনা করবে।

পাঠ ৪

শিরক (الشِّرْكُ)

শিরক শব্দের অর্থ অংশীদার সাব্যস্ত করা, সমকক্ষ মনে করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে শিরক বলে। অপর কোনো কিছুকে আল্লাহ তায়ালার সমতুল্য বা সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করাও শিরক। যে ব্যক্তি শিরক করে, তাকে বলা হয় মুশরিক (مُشْرِكٌ)।

তাওহিদের বিপরীত হলো শিরক। তাওহিদ হলো একত্ববাদ। আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়-এরূপ বিশ্বাসকে তাওহিদ বলে। পক্ষান্তরে, শিরক হলো আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা। কিংবা কাউকে আল্লাহর সমপর্যায়ের মনে করা। শিরক প্রধানত তিন প্রকার। যথা :

- ক. আল্লাহ তায়ালার সত্তার সাথে শিরক করা। যেমন- আল্লাহ তায়ালার পিতা, পুত্র কিংবা স্ত্রী আছে—এরূপ বিশ্বাস রাখা।
- খ. আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিতে অংশীদার সাব্যস্ত করা। যেমন- সৃষ্টিকর্তা একজন না মেনে একাধিক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি, জীবিকা, জীবন, মৃত্যু ইত্যাদির মালিক মনে করা।
- গ. আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে শিরক করা। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত না করে অন্য কারো ইবাদত করা। যেমন- অগ্নিপূজা ও মূর্তিপূজা করা।

শিরকের কুফল ও পরিণতি

আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধ হচ্ছে শিরক। পৃথিবীতে যত প্রকার যুলুম আছে শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম বা পাপ। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝

অর্থ : “নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম।” (সূরা লুকমান, আয়াত ১৩)

শিরকের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যায় আচরণ করে। কেননা আল্লাহ তায়ালাই মানুষের একমাত্র স্রষ্টা। সকল ইবাদত ও প্রশংসা লাভের হকদারও তিনিই। শিরকের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদত করে। ফলে আল্লাহর সাথে চরম অন্যায় করা হয়।

অন্যদিকে শিরক মানুষের মর্যাদাহানিকর কর্মও বটে। কেননা মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা জীব বা আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ তায়ালা সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অথচ মুশরিকরা শিরকে লিপ্ত হয়ে অন্য সৃষ্টির কাছে মাথা নত করে। ফলে মানুষের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। এজন্যই কুরআন মজিদে শিরককে সবচেয়ে বড় যুলুম বলা হয়েছে।

শিরকের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তায়ালা শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। তিনি বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ

অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ব্যতীত অন্য যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।” (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১৬)

আমরা শিরক ও এর কুফল সম্পর্কে ভালোভাবে জানব এবং সর্বদা এ জঘন্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকব। আমাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনদেরকে শিরকের কুফল ও শোচনীয় পরিণতির কথা বলে সতর্ক করব।

দলগত কাজ : কী কী কাজে শিরক হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রদর্শন কর।

বাড়ির কাজ : শিরক পরিহার করার উপায়সমূহ বর্ণনা কর।

পাঠ ৫

ইমান মুফাস্সাল (الْإِيمَانُ الْمُفَصَّلُ)

أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدِيرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ
بَعْدَ الْمَوْتِ

(উচ্চারণ: আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি, ওয়া কুতুবিহি, ওয়া রুসুলিহি, ওয়া ল ইয়াওমিল আখিরি, ওয়া ল কাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়া ল বা‘সি বা‘দাল মাউত।)

অর্থ : আমি ইমান আনলাম-

১. আল্লাহর প্রতি
২. তার ফেরেশতাগণের প্রতি
৩. তার কিতাবগুলোর প্রতি
৪. তার রাসুলগণের প্রতি
৫. আখিরাতের প্রতি
৬. তাকদিরের প্রতি, যার ভালো-মন্দ আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকেই হয় এবং
৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।

ব্যাক্য ও তাৎপর্য

ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। আর মুফাস্সাল অর্থ বিস্তারিত। ইমান মুফাস্সাল অর্থ বিস্তারিত বিশ্বাস। বিস্তারিতভাবে ইমানের বিষয়গুলোর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথকভাবে সবকটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরি। উক্ত বাক্যে ইমানের সাতটি বিষয়ের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে এ সাতটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো—

১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

ইমানের সর্বপ্রথম বিষয় হলো মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। পূর্বের শ্রেণিতে আমরা ইমান মুজমাল সম্পর্কে জেনেছি। সেখানে আল্লাহ তায়ালায় প্রতি কিরূপ বিশ্বাস করতে হবে তা বলা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তায়ালায় প্রতি বিশ্বাসই ইমানের মূল। আমরা আল্লাহ তায়ালায় তাওহিদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস করব। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে একক ও অতুলনীয়। তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য কেউ নেই। তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণ রয়েছে। তিনিই একমাত্র মাবুদ। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ-ই ইবাদতের যোগ্য নয়।

২. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেশতাগণ আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা নুরের তৈরি। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ তায়ালায় যিকির ও তাসবিহ পাঠে রত থাকেন। তাঁদের সংখ্যা অগণিত। আল্লাহ তায়ালায় হুকুম ব্যতীত তারা কোনো কাজই করেন না।

আল্লাহর নির্দেশ পালনই তাঁদের একমাত্র কাজ। ফেরেশতাগণের মধ্যে চারজন রয়েছেন নেতৃস্থানীয়। তারা হলেন: (১) হযরত জিবরাইল (আ.), যিনি আল্লাহর বাণী নবি-রাসুলগণের নিকট পৌঁছে দিতেন। (২) হযরত মিকাইল (আ.), যিনি আল্লাহর হুকুমে মানুষ ও জীবজন্তুর জীবিকা বণ্টন কাজে নিয়োজিত আছেন। (৩) হযরত আযরাইল (আ.), যিনি মানুষ ও জিনদের মৃত্যু ঘটানো বা রুহ কবয় করার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত আছেন। (৪) হযরত ইসরাফিল (আ.), যিনি শিঙ্গা নিয়ে আল্লাহর নির্দেশের জন্য প্রস্তুত আছেন। আল্লাহর আদেশ পাওয়া মাত্রই শিঙ্গায় ফুৎকার দেবেন। এতে দুনিয়া ও এর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর দ্বিতীয়বার ফুৎকারে আবার সবাই জীবন ফিরে পেয়ে আখিরাতে ময়দানে বিচারের জন্য আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। অন্য সব ফেরেশতা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হুকুম পালনে রত আছেন।

৩. কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ তায়ালা বহু আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। এগুলো সবই আল্লাহর কালাম বা বাণী। তিনি নবি-রাসুলগণের মাধ্যমে এ কিতাবগুলো মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছেন। এসব কিতাব মানবজাতির জন্য আলোম্বরূপ। এসবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব হলো আল-কুরআন। এসব কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে।

৪. রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় দান করেছেন। সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখিয়েছেন। তাঁরা নিজ থেকে এসব করেননি। বরং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েই তাঁরা তাওহিদের বাণী প্রচার করতেন। তাঁদেরকে আল্লাহর প্রেরিত নবি ও রাসুল হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে।

৫. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

দুনিয়ার জীবনই মানুষের শেষ নয়। বরং আখিরাতের জীবনও রয়েছে। আখিরাত হলো পরকাল। মৃত্যুর পরপরই এ জীবনের শুরু। মানুষ সেখানে দুনিয়ার ভালো কাজের জন্য জান্নাত লাভ করবে এবং মন্দ কাজের জন্য জাহান্নাম পাবে। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসও ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৬. তকদিরের প্রতি বিশ্বাস

তকদিরকে আমরা ভাগ্য বা নিয়তি বলে থাকি। সবকিছুর তকদিরই আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তায়ালাই তকদিরের নিয়ন্ত্রক। তকদিরের ভালো-মন্দ যাই ঘটুক, সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। তকদির একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। সুতরাং আমরা তকদিরে বিশ্বাস করব এবং ভালো ফল লাভের জন্য চেষ্টা করব।

৭. পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস

মৃত্যু একটি অনিবার্য সত্য। সকল জীবিত প্রাণীকেই মরতে হবে। আবার এমন একসময় আসবে, যখন আল্লাহ তায়ালার সবকিছু ধ্বংস করে দেবেন। পৃথিবীর কোনো কিছুই সেদিন অবশিষ্ট থাকবে না। কেবল আল্লাহ তায়ালাই থাকবেন। এরপর একসময় আল্লাহ তায়ালার পুনরায় সবাইকে জীবিত করবেন। মৃত্যুর পর পুনরায় এ জীবিত হওয়াকেই পুনরুত্থান বলে।

এ সময় সবাইকে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে এবং দুনিয়ার সকল কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উপর্যুক্ত সাতটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করা অপরিহার্য। এর যেকোনো একটির প্রতিও অবিশ্বাস করা যাবে না। এর কোনো একটিকেও অবিশ্বাস করলে মানুষ মুমিন হতে পারবে না। আমরা ইমান মুফাস্সালে বর্ণিত সাতটি বিষয় সম্পর্কে জানব। এগুলোর প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করব।

দলগত কাজ : ইমানের সাতটি মূল বিষয় দলগত আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

বাড়ির কাজ : প্রত্যেকে ইমান মুফাস্সাল অর্থসহ মুখস্থ করে আসবে এবং একে অপরকে শুনাবে।

পাঠ ৬

পরিচয়

আল-আসমাউল হুসনা (الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى)

আসমা শব্দটি শব্দের অর্থ নামসমূহ। আর হুসনা শব্দের অর্থ সুন্দর। আর আসমাউল হুসনা অর্থ সুন্দর নামসমূহ। আল্লাহ তায়ালা সকল গুণের অধিকারী। তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা, দয়াবান, ক্ষমাশীল, শাস্তিদাতা ও পরাক্রমশালী। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদৃষ্টা ও সর্বশক্তিমান। তিনিই মালিক। পবিত্র কুরআনে এসেছে-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ

অর্থ : “কোনো কিছুই তার সদৃশ নয়।” (সূরা আশ্-শুরা, আয়াত ১১)

আল্লাহ তায়ালা অতুলনীয়। তার সত্তা যেমন অনাদি ও অনন্ত, তার গুণাবলিও তেমনি অনাদি ও অনন্ত। আল্লাহ তায়ালা এসব গুণ নানা শব্দে নানা উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়। এসব গুণের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। এ নামগুলোকেই একত্রে আসমাউল হুসনা বলা হয়। এই পাঠে আমরা আল্লাহ তায়ালা কতিপয় গুণবাচক নামের পরিচয় লাভ করব।

প্রভাব

মানবজীবনে আল্লাহ তায়ালা গুণবাচক নামসমূহের প্রভাব অপরিসীম। কেননা এসব গুণবাচক নাম মানবজীবনে দূদিক থেকে প্রভাব বিস্তার করে।

প্রথমত: এসব নামের দ্বারা আমরা আল্লাহ তায়ালাকে চিনতে পারি। তার ক্ষমতা ও গুণাবলির পরিচয় পাই। যেমন-রাহমান, রাহিম নাম দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহ তায়ালা দয়াবান। গাফফার নাম দ্বারা বুঝি যে মহান আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল। সুতরাং পাপ করে ফেললে আমরা তার নিকট ক্ষমা চাই। তিনিই পারেন সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করতে।

অন্যদিকে তিনিই হলেন জাব্বার (প্রবল), কাহ্‌হার (মহাপরাক্রান্ত)। এগুলো স্মরণ থাকলে আমরা কোনো পাপ কাজ করতে পারি না। কেননা আমরা বুঝতে পারি যে পাপ কাজ করলে তিনি আমাদের শাস্তি দেবেন।

তাছাড়া আল্লাহ তায়ালাই রিজিকদাতা, নিয়ামতদাতা, করুণাময়। ফলে আমরা তার নিয়ামত উপভোগ করে তার শোকরিয়া আদায় করতে পারি।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তায়ালা কিছু গুণবাচক নাম আমাদেরকে উত্তম গুণাবলি অর্জনে উৎসাহিত করে।

যেমন: আল্লাহ পাক দয়ালু, আমরাও সকলের প্রতি দয়া করব, তিনি ন্যায়পরায়ণ, আমরাও সকল ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হবো। তিনি রিজিকদাতা। আমরাও ক্ষুধার্তকে অনু দেবো। আল্লাহ তায়ালা পরম ধৈর্যশীল। আমরাও বিপদে-আপদে ধৈর্যধারণ করব। এভাবে আল্লাহ তায়ালা গুণবাচক নামসমূহ আমাদেরকে উত্তম চরিত্রবান হতে উৎসাহিত করে।

আল্লাহ্‌ হায়্যুন (اللَّهُ حَيٌّ)

হায়্যুন শব্দের অর্থ চিরজীব। যিনি চিরকাল ধরে জীবিত। আল্লাহ্‌ হায়্যুন অর্থ আল্লাহ্‌ চিরজীব। তিনি চিরকাল ধরে আছেন, থাকবেন। যখন কোনো কিছুই ছিল না, তখনও তিনি ছিলেন। আবার কিয়ামতে যখন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, তখনও তিনিই থাকবেন। তার কোনো ক্ষয় নেই, রোগ-শোক, দুঃখ-জরা, তন্দ্রা-নিদ্রা কিছুই নেই। কোনোরূপ ধ্বংস তাকে স্পর্শও করতে পারে না। তিনি সকল ক্ষয় ও ধ্বংস থেকে মুক্ত। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ط

অর্থ: “তিনিই আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরজীব ও সর্বসত্তার ধারক। তাকে তন্দ্রা এবং নিদ্রা স্পর্শ করে না।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৫)

আমরা আল্লাহ্‌ তায়ালায় এ গুণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। সকল কাজকর্মে আমরা প্রাণবন্ত থাকব। অলসতা, নির্জীবতা পরিহার করব। ক্লান্তি, শ্রান্তি, তন্দ্রা, নিদ্রা ইত্যাদি যেন আমাদের কাজে কোনো প্রভাব না ফেলে সে চেষ্টা করব। তাহলে আমরা সফলতা লাভ করব।

আল্লাহ্‌ কায়্যুমুন (اللَّهُ قَيُّومٌ)

কায়্যুমুন শব্দের অর্থ চিরস্থায়ী, চিরবিরাজমান, চিরবিদ্যমান, সবকিছুর ধারক সত্তা। ইসলামি পরিভাষায় সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সত্তা অনাদি ও অনন্তকালব্যাপী বিরাজমান, তিনিই কাইয়ুম। অন্য কথায় আপন সত্তার জন্য যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন অথচ সকল সত্তার ধারক, এরূপ সত্তাকে কাইয়ুম বলা হয়। আল্লাহ্‌ কায়্যুমুন অর্থ আল্লাহ্‌ চিরস্থায়ী। তিনিই সবকিছুর ধারক। তিনি বিশ্ববিধাতা। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। আসমান-জমিনের সবকিছুই তার নিয়ন্ত্রণাধীন।

আল্লাহ্‌ তায়ালা চিরবিরাজমান। তিনি সবসময় বিদ্যমান। তিনি অনাদি-অনন্ত। তিনি সবকিছু জানেন। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তারই নিয়ন্ত্রণে।

তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং নিপুণভাবে পরিচালনা করেন। কিয়ামত পর্যন্ত সবকিছুর রক্ষক তিনিই। আখিরাতেও তিনিই একমাত্র নিয়ন্ত্রক। তিনি ব্যতীত আর কোনো চিরবিরাজমান সত্তা নেই।

আল্লাহ্‌ আযিযুন (اللَّهُ عَزِيزٌ)

আযিযুন শব্দের অর্থ মহাপরাক্রমশালী। আল্লাহ্‌ তায়ালাই সকল ক্ষমতার উৎস ও মালিক। তার ক্ষমতা অসীম। তার ক্ষমতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। কেউ তার ক্ষমতার মোকাবিলা করতে পারে না। আল-কুরআনে এসেছে—

وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝

অর্থ: “আল্লাহ্‌ পরমপরাক্রমশালী, দণ্ডদানকারী।” (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৪)

আল্লাহ তায়ালা অসীম ক্ষমতাবান। কেউ তাকে অপারগ করতে পারে না। তার সাথে ধোঁকা-প্রতারণা করতে পারে না। কেউ তার কৌশল বা পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে পারে না। তিনি যা চান তা-ই হয়। তার কুদরত বা ক্ষমতার মোকাবিলা করার শক্তি কারো নেই। তিনি যাকে ইচ্ছা অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতে পারেন। দুনিয়ার বড় বড় ক্ষমতাবানদের তিনি ক্ষুদ্র প্রাণী বা বস্তু দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। যেমন তিনি ফেরাউনকে পানি দ্বারা, নমরুদকে মশা দ্বারা, আবরাহাকে ছোট ছোট পাখি দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাকে অস্বীকারকারী কেউই তার আযাব বা শাস্তি থেকে বাঁচতে পারেনি। ভবিষ্যতেও পারবে না।

আমরা সদাসর্বদা আল্লাহ তায়ালায় এসব গুণের কথা মনে রাখব, এ গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করব। তাহলে সৎকাজ করা আমাদের জন্য সহজতর হবে।

আল্লাহু খাবিরুন (اللَّهُ خَبِيرٌ)

খাবিরুন অর্থ সম্যক অবহিত। আল্লাহু খাবিরুন অর্থ আল্লাহ তায়ালা সবকিছু সম্যক অবহিত, সবকিছু জানেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সকল খবর রাখেন।” (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩)

আল্লাহ তায়ালা সবকিছু জানেন। তিনি সকল বিষয়েই সম্যক অবহিত। কোনো কিছুই তার নিকট অজানা নয়। আমরা যা বলি বা করি সবই তিনি জানেন। এমনকি আমরা যেসব বিষয়ের কল্পনা করি, তাও তার অজানা নয়। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বস্তু বা প্রাণীর খবরও তিনি জানেন। গভীর সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর খবরও তার জানা। অন্ধকার রাতে কালো পাথরের উপর কালো পিপীলিকার চলাফেরাও তার অজানা নয়। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার মতো খালি চোখে যেসব প্রাণী দেখা যায় না, সে সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবহিত। এককথায় আসমান-জমিন ও এ বিশ্বজগতের এমন কোনো জিনিস নেই যা তার জ্ঞানের বাইরে। তিনি সবকিছু জানেন।

আমরা আল্লাহ তায়ালায় এ গুণের তাৎপর্য উপলব্ধি করব। সবসময় মনে রাখব যে তিনি আমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে জানেন। আমাদের সব পাপপুণ্য কিছুই তাঁর অজানা নয়। আমরা অন্যায় থেকে বিরত থাকব এবং তার ভালোবাসা অর্জন করব।

আল্লাহু সাবুরুন (اللَّهُ صَبُورٌ)

সাবুরুন শব্দের অর্থ পরমধৈর্যশীল। আল্লাহু সাবুরুন অর্থ আল্লাহ পরমধৈর্যশীল। আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে বড় ধৈর্যশীল। তার ধৈর্যের কোনো সীমা নেই।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে নানা নিয়ামত দান করেছেন। তিনিই মানুষকে রিজিক দেন, লালনপালন করেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় খাদ্য-পানীয় দেন। ভয়-ভীতিতে নিরাপত্তা দান করেন। আলো, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, পানি সবকিছু তারই দান। সুন্দর এ পৃথিবীর সবকিছুই তিনি মানুষের কল্যাণে দান করেছেন।

এতকিছুর পরও অনেক মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করে না। তার অবাধ্য হয়। তার ইবাদত ছেড়ে দেয়। আল্লাহ তায়ালা এসব ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করেন। তিনি মানুষকে নিয়ামত দান বন্ধ করে দেন না। অবাধ্য হলে তিনি যদি আলো বা পানি বন্ধ করে দিতেন, তাহলে সকলে ধ্বংস হয়ে যেত। অবাধ্যতার জন্য তিনি তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তিও দেন না। বরং তিনি সুযোগ দেন। মানুষ যদি তওবা করে ফিরে আসে, তবে তিনি ক্ষমা করে দেন। এরপর যদি মানুষ আবার পাপ করে তিনি পুনরায় ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করেন। বান্দা যদি আবার তওবা করে তিনি পুনরায় ক্ষমা করেন। আল্লাহ ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। তিনি সর্বদা ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন। আল্লাহ বলেন—

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৫৩)

ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ জান্নাত দান করবেন। মহান আল্লাহ বলেন—

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝

অর্থ : “তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৫৫)

আমরাও আল্লাহ তায়ালায় এ গুণের অনুশীলন করব। অধীনদেরকে ক্ষমা করব। বিপদে-আপদে নিরাশ হবো না, বরং ধৈর্যধারণ করব।

দলগত কাজ : মানবজীবনে আল্লাহ তায়ালায় গুণবাচক নামসমূহের প্রভাব বর্ণনা কর।

বাড়ির কাজ : আল্লাহর তায়ালায় পাঁচটি গুণবাচক নাম অর্থসহ লেখ।

পাঠ ৭

الرِّسَالَةُ (রিসালাত)

রিসালাত অর্থ বার্তা, সংবাদবহন, চিঠি, খবর পৌছানো ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালায় বাণী ও পরিচয় মানুষের নিকট পৌছানোর দায়িত্বকে রিসালাত বলে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই একমাত্র রিজিকদাতা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা। কিন্তু মানুষ নিজে থেকে আল্লাহ তায়ালায় পরিচয় লাভ করতে পারে না। বৃন্দ্রি-বিবেক খাঁটিয়ে মানুষ বুঝতে পারে যে এ মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন। কিন্তু তিনি কে, তার গুণাবলি কীরূপ, তার ক্ষমতা কতো - এসব কিছুই মানুষ নিজে নিজে জানতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন পথপ্রদর্শন কর। আল্লাহ তায়ালা নিজেই মানুষের মধ্য থেকে এসব পথপ্রদর্শক নিয়োগ করেছেন। তারা মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালায় সঠিক পরিচয় তুলে ধরার দায়িত্ব পালন

করেছেন। তাঁরা তাওহিদ ও আখিরাত সম্পর্কে মানুষকে ধারণা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বাণী ও আদেশ-নিষেধ মানুষের নিকট পৌঁছে দেন। এসব দায়িত্বকেই এক কথায় রিসালাত বলা হয়। যাঁরা এসব দায়িত্ব পালন করেন, তাঁরা হলেন নবি কিংবা রাসুল। সৎপথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ সকল জাতির নিকট নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا

অর্থ : “এবং নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি।” (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৩৬)

নবি-রাসুলগণ আল্লাহ তায়ালা মনোনীত বান্দা। তাঁরা পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁরা সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।

রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

রিসালাতে বিশ্বাস করা ইমানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাওহিদে বিশ্বাস করার সাথে সাথে আমাদের রিসালাতেও বিশ্বাস করতে হবে। কেননা রিসালাতে বিশ্বাস না করলে মুমিন হওয়া যায় না।

নবি-রাসুলগণ রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা ছিলেন আল্লাহ তায়ালা ও মানবজাতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী। তাঁদের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ তায়ালা সঠিক পরিচয় পাই। তাঁরাই আমাদের নিকট মহান আল্লাহর বাণী নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তায়ালা আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। সুতরাং রিসালাত ও নবি-রাসুলগণের উপর বিশ্বাস করা অপরিহার্য। তাঁদেরকে অস্বীকার করলে ইমানের সকল বিষয়ই অস্বীকার করা হয়। যেমন- তোমার কোনো বন্ধু কারো মাধ্যমে তোমার নিকট কোনো সংবাদ প্রেরণ করল। এক্ষেত্রে সংবাদ বাহকের প্রতি সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তাহলেই কেবল বাহকের আনীত সংবাদ বিশ্বাস করা যাবে। কেননা সংবাদ বাহককে বিশ্বাস করা না গেলে তার আনীত সংবাদও বিশ্বাস করা যায় না। এতে নানা সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ফলে তোমার বন্ধুর উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না।

তদুপ নবি-রাসুলগণ হলেন সংবাদ বাহকের ন্যায়। তাঁরা আল্লাহ তায়ালা বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। যদি আমরা তাঁদের অস্বীকার বা অবিশ্বাস করি, তাহলে তাঁদের আনীত কিতাব ও বর্ণনার মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তায়ালা, আখিরাত, কিয়ামত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অবিশ্বাস জন্ম নেবে। সুতরাং সর্বপ্রথম তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আল্লাহ তায়ালাই তাঁদেরকে সংবাদ বহনের জন্য মনোনীত করেছেন - এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে। তবেই আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে ইমানের সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করতে পারব। সুতরাং বোঝা গেল, রিসালাতে বিশ্বাস করার গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা সকল নবি-রাসুলের প্রতি বিশ্বাস করব। কাউকে অবিশ্বাস করব না। আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

অর্থ : “আমরা তাঁর রাসুলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৮৫)

অর্থাৎ আমরা সকলের প্রতিই বিশ্বাস করি। কারো প্রতি অবিশ্বাস করি না। নবি-রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস করা ফরজ। তাঁদেরকে অবিশ্বাস করলে ইমানদার হওয়া যায় না। বরং আমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা

নবি-রাসুলগণের কথায় বিশ্বাস না করে আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব, আমরা সমস্ত নবি-রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করে চলব।

দলগত কাজ : রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা কর।

পাঠ ৮ (الْوَحْيُ) ওহি

ওহি (وَحْيٌ) আরবি শব্দ। এর অর্থ ইশারা, ইঙ্গিত, গোপন কথা ইত্যাদি। সাধারণত কোনো ব্যক্তির নিকট গোপনে প্রেরিত সংবাদকে ওহি বলা হয়।

ইসলামি পরিভাষায়, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবি-রাসুলগণের নিকট প্রেরিত সংবাদ বা বাণীকে ওহি বলা হয়। যেমন- আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর আল-কুরআন নাজিল করেছেন। সুতরাং আল-কুরআন হলো ওহি।

ওহি অবতরণ

আল্লাহ তায়ালা নানাভাবে নবি-রাসুলগণের নিকট ওহি প্রেরণ করতেন। তন্মধ্যে দুটি পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ।

- ক. ফেরেশতার মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা তার বাণী ফেরেশতার মাধ্যমে নবি-রাসুলগণের নিকট পৌছাতেন। যেমন- হযরত জিবরাইল (আ.) হলেন প্রধান ওহিবাহক ফেরেশতা। তিনি নবি-রাসুলগণের নিকট আল্লাহ তায়ালা বাণী নিয়ে হাজির হতেন।
- খ. সরাসরি কথা বলার মাধ্যমে। অনেক সময় আল্লাহ তায়ালা সরাসরি নবি-রাসুলগণের সাথে কথা বলতেন। যেমন- আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে তুর পাহাড়ে কথা বলেছেন। আমাদের প্রিয় নবি (স.) ও মিরাজের রজনীতে আল্লাহ তায়ালা সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।

প্রকারভেদ : ওহি প্রধানত দুই প্রকার। যথা-

- ক. ওহি মাতলু : অর্থাৎ যে ওহি তিলাওয়াত করা হয়। যেমন- কুরআন মজিদ। কুরআন মজিদ সালাতে তিলাওয়াত করা হয় বলে একে ওহি মাতলু বলা হয়।
- খ. ওহি গায়র মাতলু : অর্থাৎ যে ওহি তিলাওয়াত করা হয় না। যেমন- হাদিস শরিফ। হাদিস শরিফ সালাতে তিলাওয়াত করা হয় না। এজন্য একে ওহি গায়র মাতলু বলে।

মহানবি (স.)-এর বাণী, কাজ ও অনুমোদনকে হাদিস বলে। হাদিসও ওহির অন্তর্ভুক্ত। কেননা মহানবি (স.) নিজ থেকে কিছু বলতেন না বরং আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েই তিনি কথা বলতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

অর্থ : “আর তিনি (হযরত মুহাম্মদ স.) মনগড়া কোনো কিছু বলেন না। বরং এটা তো ওহি, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।” (সূরা আন-নাজ্‌ম, আয়াত ৩-৪)

গুরুত্ব

ওহি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওহি সরাসরি আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ থেকে নাজিল হয়। এটা হলো অকাটা জ্ঞান। এতে কোনোরূপ ভুলত্রুটি নেই। ওহির সংবাদ সকল প্রকার সন্দেহের উর্ধ্বে। ওহি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস। ওহির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সকল প্রকার জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ থেকে অবতরিত বলে এ জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ ও অতুলনীয়। আমরা নিজেদের গৃহ সম্পর্কে ভালোভাবে জানি। আমাদের গৃহে কোথায় কোন জিনিস রাখা আছে তা আমরাই সবচেয়ে ভালো বলতে পারব। বাইরের কেউ তা পারবে না। তদ্রূপ আমরাও অন্যের ঘরে কোথায় কী আছে তা বলতে পারব না। তেমনিভাবে আল্লাহ সারা বিশৃঙ্খলতার স্রষ্টা। তিনি নিজ কুদরতে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার হুকুমেই সকল কিছু পরিচালিত হয়। পৃথিবীর কোথায় কোন জিনিস কী অবস্থায় আছে আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। প্রত্যেক জিনিসের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি অবহিত। সুতরাং তিনি যে সংবাদ-জ্ঞান নাজিল করেন তা অকাটা। কেউ এরূপ জ্ঞান খণ্ডন করতে পারে না।

আল-কুরআন ও হাদিস ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত। এগুলোর মাধ্যমেই আমরা ইসলামের সকল বিধি-বিধান জানতে পারি। তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির জ্ঞানও আমরা এগুলো থেকেই লাভ করি। এগুলো না থাকলে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। সুতরাং ওহির গুরুত্ব অপরিসীম। ওহির উপর বিশ্বাস স্থাপন করলে মানুষের ইমান পূর্ণাঙ্গ হয়।

দলগত কাজ : শ্রেণির সব শিক্ষার্থী দুই দলে ভাগ হয়ে একদল ওহির অর্থ ও প্রকার সম্পর্কে মুখস্থ বলবে এবং অন্যদল ওহির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবে। আবার প্রথম দল গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবে, দ্বিতীয় দল ওহির অর্থ ও প্রকার সম্পর্কে মুখস্থ বলবে।

পাঠ ৯

আখিরাত (الْآخِرَةُ)

আখিরাত অর্থ পরকাল। পরকাল হলো ইহকালের বা দুনিয়ার জীবনের পরের জীবন। দুনিয়ার জীবনই মানুষের শেষ জীবন নয়। বরং মানুষের জন্য আর একটি জীবন রয়েছে। সে জীবনই পরকালীন জীবন। পরকালীন জীবন অনন্ত। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন—

إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

অর্থ: “এ দুনিয়ার জীবনতো অস্থায়ী উপভোগের বস্তুমাত্র। আর নিঃসন্দেহে আখিরাতই হলো চিরস্থায়ী আবাস।” (সূরা আল-মু’মিন, আয়াত ৩৯)

আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

আখিরাতে বিশ্বাস ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আখিরাতে বিশ্বাস করা অপরিহার্য। আখিরাত অবিশ্বাস করলে মানুষ ইমানদার হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের গুণাবলি সম্পর্কে বলেন-

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

অর্থ: “আর তাঁরা (মুত্তাকিগণ) আখিরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৪)
আখিরাত হলো পরকাল। কবর, হাশর, মিয়ান, সিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি আখিরাতের একেকটি পর্যায়। এ সবকটি বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে ইমান আনতে হবে। কোনোটিই অবিশ্বাস করা যাবে না। বলা হয়ে থাকে,

الدُّنْيَا مَزْرَعَةٌ الْآخِرَةُ

অর্থ: ‘দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।’

অর্থাৎ দুনিয়া হলো আমল করার স্থান। আখিরাত হলো ফলাভোগের স্থান। সেখানে মানুষ কোনো আমল করতে পারবে না। বরং দুনিয়াতে মানুষ যেরূপ আমল করেছে সেরূপ ফল ভোগ করবে। কৃষক শস্যক্ষেত্রে যেরূপ চাষাবাদ করে, সেরূপই ফল লাভ করে। জমিতে ধান লাগালে ফসল হিসেবে ধানই পাওয়া যায়। আর কেউ যদি জমিতে কাঁটাগাছ রোপণ করে তবে সে শুধু কাঁটাই লাভ করে। দুনিয়ার জীবনও তদ্রূপ। আর দুনিয়াতে যে ব্যক্তি ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, সে আখিরাতে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে। তাঁর আবাসস্থল হবে চিরশান্তির স্থান জান্নাত। অন্যদিকে যে ব্যক্তি ইমান আনবে না এবং অন্যায় ও খারাপ কাজ করবে, আখিরাতে সে শাস্তি ভোগ করবে। তার ঠিকানা হবে শাস্তি ভোগের স্থান জাহান্নাম। সে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল পুড়বে। আখিরাতে কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করবে না। বরং চিরকাল ধরে শাস্তি অথবা শাস্তি ভোগ করবে।

আখিরাতে বিশ্বাস করলে মানবজীবন সুন্দর হয়। মানুষ উত্তম চরিত্রবান হিসেবে গড়ে ওঠে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সব ধরনের খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। এ বিশ্বাসের ফলে মানুষ কোনোরূপ অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি, মিথ্যাচার, অশ্লীল কাজকর্ম করতে পারে না। বরং সে সর্বদা উত্তম ও নেক কাজে আগ্রহী হয়। আখিরাতে শান্তির আশায় মানুষ দুনিয়াতে ভালো গুণাবলির অনুশীলন করে। ফলে মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতএব, আমরা আখিরাতের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করব। আখিরাতে শান্তি ও সফলতা লাভের জন্য দুনিয়ায় নেক আমল করব। আমাদের দুনিয়ার জীবন শান্তিময় হবে। আর পরকালে আমরা জান্নাত লাভ করব।

সিরাত (الصِّرَاطُ)

সিরাত শব্দের অর্থ পথ, রাস্তা, পুল, পন্থতি ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, সিরাত হলো জাহান্নামের উপর স্থাপিত একটি পুল। এ পুল পার হয়ে জান্নাতিগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আখিরাতে সকল মানুষকেই এ পুলের উপর আরোহণ করে তা অতিক্রম করতে হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। যে নেক আমল করবে মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। জান্নাতিগণ সিরাতের উপর দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাঁদের আমল অনুসারে সিরাত নানারকম হবে। কারো জন্য সিরাত হবে বিশাল ময়দানের মতো। আবার কম নেককারদের জন্য তাদের আমল অনুসারে সিরাতের প্রশস্ত কম হবে। ইমানদারগণ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী সিরাত অতিক্রম করবেন। কেউ বিদ্যুৎগতিতে সিরাত পার হবেন। কেউ ঝড়ের গতিতে, কেউ ঘোড়ার গতিতে, কেউ দৌড়ের গতিতে, আবার কেউ হেঁটে হেঁটে সিরাত পার হবেন। কম আমলকারী জান্নাতিগণ হামাগুড়ি দিয়ে অতিক্রম সিরাত পার হবেন।

সিরাত হলো অশ্বকার পুল। সেখানে ইমান ও নেক আমল ব্যতীত আর কোনো আলো থাকবে না। সুতরাং দুনিয়ায় যে দৃঢ় ইমান এবং বেশি নেক আমলের অধিকারী হবে, সিরাত হবে তাঁর জন্য সবচেয়ে বেশি আলোকিত। ইমানের আলোতে সে সহজেই সিরাত অতিক্রম করবে। জান্নাতিগণের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) সিরাত অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাঁর পূর্বে কেউই এ মর্যাদা লাভ করবে না।

অন্যদিকে জাহান্নামিদের জন্য সিরাত অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান। তাদের জন্য সিরাত হবে চুলের চাইতেও সূক্ষ্ম এবং তরবারি অপেক্ষা ধারালো। সেখানে কোনো আলো থাকবে না। বরং সিরাত হবে ঘুটঘুটে অশ্বকার। এমন অবস্থায় তারা সিরাতে আরোহণ করবে। তারা কিছুতেই সিরাত অতিক্রম করতে পারবে না। বরং তাদের হাত-পা কেটে তারা জাহান্নামে পতিত হবে।

সিরাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَأَنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝

অর্থ : “এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।” (সূরা মারইয়াম, আয়াত ৭১)

এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّمَ

অর্থ : “জাহান্নামের উপর সিরাত স্থাপিত হবে।” (মুসনাদে আহমাদ)

আমরা সিরাতে বিশ্বাস করব। সহজে সিরাত অতিক্রম করার জন্য দুনিয়াতে বেশি বেশি নেক আমল করব।

মিযান (الْمِيزَانُ)

মিযান অর্থ দাড়িপাল্লা, তুলাদণ্ড, মানদণ্ড বা পরিমাপ করার যন্ত্র। ইসলামি পরিভাষায়, যে পরিমাপক যন্ত্রের দ্বারা কিয়ামতের দিন মানুষের পাপপুণ্যকে ওজন করা হবে, তাকে মিযান বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ

অর্থ : “আর আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব।” (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ৪৭)

আমরা নিশ্চয়ই দাড়িপাল্লা দেখেছি। এর দুটি পাল্লা থাকে এবং মাঝে একটি দণ্ড থাকে। এগুলোর মাধ্যমে আমরা নানা জিনিস পরিমাপ করে থাকি। মিযানও তেমনি একটি মানদণ্ড। এর দুটি পাল্লাতে মানুষের সকল আমল ওজন করা হবে। এর এক পাল্লায় থাকবে পুণ্য এবং অন্য পাল্লায় উঠানো হবে পাপ। যে ব্যক্তির পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে সে হবে জান্নাতি। আর যে ব্যক্তির পুণ্যের পাল্লা হালকা হবে এবং পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে জাহান্নামি হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْبَاقِيُونَ ۖ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۖ

অর্থ : “এবং যাদের পাল্লা (পুণ্যের) ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।” (সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত ১০২-১০৩)

মিযানের পাল্লায় পুণ্য বা নেক কাজ বেশি হলে মানুষ সফলতা লাভ করবে। তার স্থান হবে জান্নাত। এজন্য বেশি বেশি নেক কাজ করা উচিত। প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) আমাদের নেকির পাল্লা ভারী করার জন্য বহু আমল শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন-

الْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ

অর্থ : ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলা মিযানের নেকির পাল্লা পূর্ণ করে দেয়।’ (সহিহ মুসলিম)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন- ‘দুটি বাক্য এমন আছে, যা দয়াময় আল্লাহর নিকট প্রিয়, উচ্চারণে সহজ এবং মিযানের পাল্লায় ভারী। এ দুটি বাক্য হলো-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ -

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযিম।

আমরা এ দোয়া দুটি শিখব এবং বেশি বেশি পাঠ করব। এতে আমাদের নেকির পাত্তা ভারী হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ভালোবাসবেন এবং আমরা আখিরাতে সফলতা লাভ করব।

দলগত কাজ : আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব।

বাড়ির কাজ : আখিরাতে পর্যাগুণ্ডলোর একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মহান আল্লাহকে একক সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করাকে কী বলে?

- ক. আকাইদ খ. তাকওয়া
গ. তাওহিদ ঘ. আনুগত্য

২। শিরকের মাধ্যমে মানুষ -

- i. আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে
ii. রিসালাতে অবিশ্বাস করে
iii. অন্য সৃষ্টির কাছে মাথা নত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ছামি ও সাকিব দুই বন্ধু। ছামি নামায আদায় করে, কিন্তু সাকিব তা আদায় করতে অস্বীকৃতি জানায়। ছামি এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য সাকিবকে বোঝানোর চেষ্টা করে।

৩। সাকিবের এ কাজটি কিসের শামিল?

- | | |
|--------------|--------------|
| ক. কুফরির | খ. মুনাফিকির |
| গ. বিদয়াতের | গ. শিরকির |

৪। ছামির বোঝানোর বিষয়টি হচ্ছে –

- i. সামাজিক দায়িত্ব পালন
- ii. ইমানি দায়িত্ব পালন
- iii. মুত্তাকি হওয়ার বাসনা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সমাজপতি রাজা মিয়ার ভয়ে মানুষ তটস্থ থাকে। তিনি মানুষের সাথে সবসময় খারাপ ব্যবহার করেন। তাঁর প্রকল্পে কর্মরত জনাব ফরিদ উদ্দিনকে নামায পড়তে নিষেধ করে বলেন, নামায আবার কিসের জন্য, কাজ কর তাহলেই সুখ পাবে। কিন্তু ফরিদ উদ্দিন নিয়মিত নামায আদায় করেন এবং তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। অবশেষে রাজা মিয়া ফরিদ উদ্দিনের দায়িত্বশীলতায় খুশি হন এবং তাঁকে পদোন্নতি দেন।

(ক) তাওহিদ কী?

(খ) 'আর তাঁরা (মুত্তাকিগণ) আখিরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে।' আয়াতটি ব্যাখ্যা কর।

(গ) নামাযের প্রতি রাজা মিয়ার মনোভাব ইসলামের দৃষ্টিতে কিসের শামিল? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) যে মূল বিশ্বাসের ফলে ফরিদ উদ্দিন নামাযে দৃঢ় ও দায়িত্বশীল- তা বিশ্লেষণ কর।

২। জাকারিয়া সাহেব একজন ন্যায় বিচারক। ন্যায় বিচারের কারণে ঘুষ লেনদেনকারীরা তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়। এমনকি তাঁকে বদলি করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। বিচারক সাহেব এটা জানার পরেও তার কর্তব্যে অবিচল থাকেন। তিনি আসমাউল হুসনার বিষয়গুলো নিজের জীবনে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেন এবং আল্লাহর ভয়ে সবসময় ভীত থাকেন। বিচারকের এমন মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে অবশেষে ঘুষ লেনদেনকারীরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।

- (ক) 'আসমাউল হুসনা' কী?
- (খ) 'কোনো কিছুই তার সদৃশ নয়'-আয়াতটি ব্যাখ্যা কর।
- (গ) আল্লাহর যে গুণের ভয়ে বিচারপতি জাকারিয়া সাহেব ভীত থাকেন তা ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) 'আল্লাহ্ সাবরুন' গুণের সাথে বিচারকের গুণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।